যুদ্ধ বনাম শান্তির পটভূমিকায় বান্দুং সম্মেলন

কলম্বো পঞ্চশক্তির আহ্বানে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯ টী দেশের যে মহা-সম্মেলন গত ১৮ই থেকে ২৪শে এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তাকে এক 'ঐতিহাসিক ঘটনা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সম্মেলনের বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে চুলচেরা বিচার করার আগেও একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে বান্দুং সম্মেলন ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রের আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার পথে এক বিশেষ বাধা সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ সোভিয়েট ও নয়া-চীনের নেতৃত্বে দুনিয়া জোড়া যে শান্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছে এই সম্মেলনের বিভিন্ন প্রস্তাব তাকে কার্য্যতঃ সহায়তাই করেছে।

কিন্তু এটাই সব নয়। যদি এই সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে এ কথা বলেই শেষ করি তাহলে এ বিচার নিতান্তই একপেশে হতে বাধ্য। তাই এর বিস্তারিত আলোচনাও অত্যাবশ্যক। যে সমস্ত দেশ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে নয়াচীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা অন্যান্য সমস্ত দেশ হতে ভিন্ন; নয়াচীন প্রভৃতি দেশ আজ শান্তির জন্য যে চেষ্টা করে আসছে এ সম্পর্কে আজ কারোও কোন প্রশ্ন নেই। কী এদের জাতীয় শিল্পের উন্নতি বিধান কি আন্তর্জাতিক রাজ-নৈতিক লক্ষ্য কোন ক্ষেত্রেই যুদ্ধের প্রয়োজন এদের নেই।

আজ সাম্যবাদী মাত্রেই বিশ্বাস করে যে প্রতিটি দেশের ভবিষ্যত সেই দেশের জনসাধারণই স্থির করবে। বাইরে থেকে আক্রমণ করে কোন দেশেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই বান্দুং সম্মেলনে চীন ও ভিয়েৎনাম যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা নিঃ-সন্দেহে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়েছে।

কিন্তু এ দুটো দেশ ছাড়া অন্যান্য যারা যোগ দিয়েছেন সেই সমস্ত দেশগুলিতে পুঁজিবাদী, আধা পুঁজিবাদী বা আধাসামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ দেশ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করলেও কয়েকটি দেশে এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঔপনিবেশিক শোষণের ছাপ রয়ে গেছে। তাই এ প্রসঙ্গে যে বৈশিষ্ট সব চেয়ে প্রথমে চোখে পড়ে তা হ'ল যোগদানকারী শক্তিগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা। এখানে বিচার করা দরকার যে উপরোক্ত দুটি দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলো কোন্ উদ্দেশ্য বা স্বার্থ নিয়ে যোগদান করেছে?

এই সমস্ত দেশের মধ্যে যারা তুলনা মূলক ভাবে শক্তিশালী তাদের সামনে আজ বাজারের সমস্যা মোটামুটি তীব্র হয়ে দেখা দিয়াছে। পুঁজিবাদী কাঠামোকে টিকিয়ে রেখে দেশের শিল্পের উন্নতি সাধন করতে হলেই বাজারের সমস্যা একদিন না একদিন দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু সেই বাজার দখলের জন্য সরাসরি যুদ্ধের পথ বেছে নেবার মত শক্তিও এদের নেই। নিজেদের উৎপাদিকা শক্তি ও সামরিক শক্তির অক্ষমতা বা দুর্ব্বলতার ফলে বড় বড় শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা এরা চিন্তা করতেও পারে না। তাই আজ শান্তির কথা বলে বিভিন্ন ছোট খাট দেশের সাথে সৌহার্দ্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে (regional plan) ব্যবসা বাণিজ্যের পথকে সম্প্রসারণ করার চেষ্টাই তাদের নিকট বিকল্প পন্থা হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই সোভিয়েৎ ও নয়াচীন যে উদ্দেশ্যে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠার অনলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে সেই উদ্দেশ্যে না হলেও আজ এদের শান্তির কথা না বলে কোন উপায় নেই। ফলে দুনিয়াজোড়া যে বিশ্বশান্তি আন্দোলন গড়ে উঠছে এবং যার পেছনে সোভিয়েটের নীতি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে সেই প্রচেষ্টার নিকট এই সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ যথা ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি Objectively Committed হতে বাধ্য হয়েছে। তাই লক্ষ্য ও এবং উদ্দেশ্যের এমন কি মূলগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই সম্মেলনে অনেক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। আর একেই মিঃ চৌ-এন-লাই এক কথায় বলেছেন "unity in diversity." পার্থক্য বা বিভিন্নতার মধ্যেও ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। এই মাপকাঠিতেই সম্মেলনের সফলতা বা বিফলতাকে বিচার করে দেখতে হবে।

"উনো"ন (UNO) মত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছিল যে যেমন এদিকে উনোকে আমেরিকা তার স্বার্থ অনুযায়ী পরিচালনা করার চেষ্টা প্রতি মুহূর্ত্তে করে এসেছে তেমনি এই সংস্থার সদস্য হওয়া সত্ত্বেও গ্রেট-বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ একটির পর যুদ্ধজোট গঠন করে চলেছে। নাটো (NATO), মেডো (MEDO), সিয়াডো (SEADO) প্রভৃতি চুক্তি তারই নিদর্শন। এই সম্মেলনে তাই সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ জোট গঠনের তীব্র বিরোধীতা করা হয়েছে। সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) এই সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছে যে ঔপনিবেশিকবাদই (Colonialism) বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের অন্তরায়। তাই প্রস্তাবে ঔপনিবেশিকবাদের তীব্র বিরোধীতা করা হয়েছে এবং বিশেষ ভাবে ফরাসী দেশের অধীনে টিউনিস, অ্যালজেরিয়া এবং মরক্কো, বৃটীশ উপনিবেশ এডেন, হলাণ্ডের অধীনে পশ্চিম নিউগিনি প্রভৃতি দেশ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) সর্ব্ব প্রকার মারণাস্ত্রের ব্যবহার বিশেষ ভাবে আনবিক অস্ত্র সমূহের ব্যবহার এবং পরীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রয়োজনীয়-তাকে স্বীকার করে এবং এর মারফৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দাবীতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। সাথে সাথে বর্ণ ও জাতি বৈষম্যকেও প্রতিবাদ করা হয়েছে।

(৪) 'উনো' তে এসিয়া ও আফ্রিকার অধিক সংখ্যক সদস্যকে গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং (৫) 'উনো'র নিকট বিভিন্ন দেশকে অর্থ-নৈতিক সাহায্যের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে সম্মেলন দুনিয়ার পরাধীন দেশ সমূহের ন্যায্য লড়াইকে সমর্থনই জানিয়েছে। তাই যোগদানকারী দেশ সমূহের মধ্যে যতই মত পার্থক্য থাকুকনা কেন শেষ পর্য্যন্ত এই সম্মেলন নিজেদের মধ্যে বিরোধীতাকে বড় করে না দেখে ঐক্যের প্রশ্নগুলোকে কার্য্যকরী রূপ দেবার চেষ্টা করেছে।

বিপরীত মত ও পথের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও এই সাফল্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে নয়াচীনের নেতৃত্ব এবং যোগদানকে লক্ষ্য করা দরকার। এ

(৩য় পাতায় দেখুন)

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtala Street, Calcutta-13

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল, এ
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা | ৮ই জুন '৫৫ | চার পয়সা

নরসিংগড়ে এস, ইউ, সি'র আহ্বানে জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত ২৯শে মে ধলভূমের নরসিংগড়ে এস, ইউ, সি'র আহ্বানে বিহারের কৃষক নেতা কমরেড হীরেণ সরকারের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় এস, ইউ, সি'র কেন্দ্রীয় কমিটীর সদস্য কমরেড নীহার মুখার্জী কংগ্রেসী রাজত্বে জনগণের দুঃখ দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া সুখী সমাজ গড়ার জন্য আদিবাসী এবং স্থানীয় কৃষক, মজুর ও জনসাধারণকে আগাইয়া আসিতে আহ্বান করেন।

সভাপতি কমরেড হীরেণ সরকার জঙ্গল আইনের বাধা নিষেধ, পঞ্চায়েতী দুঃশাসন, সরকারী হয়রানীর প্রতিরোধে গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও যুক্ত কৃষক সভার কমিটি গঠন করার আহ্বান জানান।

সভায় কমরেড গায়ত্রী দাশগুপ্তা ও কমরেড দুর্গা দাস বক্তৃতা দেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাব আলোচনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এটাই শেষ বৎসর। তাই এখন থেকেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার তোড়জোড় চলেছে। সরকারের পক্ষ থেকে তিনটি খসড়া প্রস্তাব প্রচার করা হয়েছে, যার ওপর বিভিন্ন মহলে আলোচনা সুরু হয়ে গিয়েছে। বামপন্থী রাজনৈতিক মহলেও সাড়া পড়েছে, কিন্তু কেহই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শোষণ-মূলক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরিকল্পনা কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখে, সে সম্পর্কে কোন আলোচনাই করছেনা, অথচ পরিকল্পনার খুঁটিনাটি থেকে উপরোক্ত প্রশ্নের আলোচনাই মার্ক্সবাদীদের কাছে প্রধান হওয়া উচিত।

পরিকল্পনাগুলিতে উদ্দেশ্য হিসাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। পরিকল্পনার মোট ৫,৬০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩,৪০০ কোটি টাকা সরকারী খাতে এবং ২,২০০ কোটি টাকা বেসরকারী খাতে ব্যয়ের জন্য ধরা হয়েছে। পরিকল্পনা রচয়িতাদের মতে এই শিল্পনীতি অনুসারে কাজ করলে অচিরেই আমরা নাকি সমাজতন্ত্রে পৌছে যাব। বেশ ভাল কথা। তবে একটু পরীক্ষা করেই দেখা যাক্।

উপরোক্ত নীতির আসল উদ্দেশ্য বুঝতে গেলে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানা দরকার। ভারত সরকার এমন সময়ে তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছে যখন বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজার দু'টি পরস্পর বিরোধী বাজারে পরিণত হয়েছে। একদিকে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক বাজার অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু স্বার্থদ্বন্দ্বে দুর্ব্বল ধনতান্ত্রিক বাজার। এই সঙ্কুচিত ধনতান্ত্রিক বাজারে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলি এসে জড় হয়েছে। এদের মধ্যে একদল তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনী শক্তি নিয়ে বিভিন্ন দেশের বাজার দখল করার চেষ্টা করছে, অপরদিকে দুর্ব্বল পুঁজিবাদী দেশগুলি প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে করতে নিজেরাও কিছু বাজার দখলের স্বপ্ন দেখছে।

পুঁজিবাদের প্রথম উন্মেষের যুগে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্প্রসারনের যে সুযোগ ছিল, শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যুগে সে সুযোগ আর নেই। বহু বৎসরের শোষণের ফলে যেমন একদিকে জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা ক্রমাগত কমে এসেছে, অপরদিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির anarchic nature of production এর দরুন ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে উদ্বৃত্ত সম্পদ এমন একটা পর্য্যায়ে এসে পড়েছে যা বিক্রয়ের জন্য কোন বাজার নেই। আবার এরই মধ্যে কিছু কিছু 'হালে স্বাধীনতা পাওয়া' অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নিজেদের স্থান করে নেবার জন্য নূতন উৎপাদিকা শক্তি (new installed capacity) সৃষ্টির চেষ্টা করছে ফলে পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনৈতিক বাজার আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। এই সঙ্কুচিত বাজারে যাতে অধিক মুনাফার ভিত্তিতে প্রতিযোগীতা করা যায় তার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার বিভিন্ন উন্নত অনুন্নত বিশেষ করে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি নিজ নিজ দেশের শিল্পক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগীতা ও anarchic nature of production কিছু পরিমানে হ্রাস করে শক্তিসঞ্চয় করার চেষ্টা করছে। এবং এর জন্যই বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা শুনা যাচ্ছে। ভারত সরকারও এই পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করছে একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। এই পদ্ধতির রূপ নেবে কয়েকটি প্রকারে। প্রথমতঃ বৃহৎ ও মূল শিল্পগুলি সম্পূর্ণ সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের সঙ্গে যুক্তভাবে শিল্প গড়ে তোলা। দ্বিতীয়তঃ ছোট ছোট শিল্পগুলিকে বড় বড় শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যে ছোট ছোট শিল্পগুলিকে একত্রিত করে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। তৃতীয়তঃ উপরোক্ত বর্ণিত শিল্পের উৎপাদিত মাল সরকারী সংগঠনের মারফত বাজারে বিক্রীর ব্যবস্থা, অল্প মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং এইসব শিল্পের জন্য দক্ষ কারিকর সরবরাহ করা ও স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া। কৃষিক্ষেত্রেও একই নীতির অনুসরণ দেখা যায়। জমিদারী উচ্ছেদ বিলগুলিকে কৃষিতে বড় বড় পুঁজিপতিদের farming গড়ে তোলার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং চাষীদের ক্ষেতমজুরে পরিণত করা হচ্ছে। এই farming যাতে ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে তাই একটি State Bank করা হচ্ছে যার মারফত এই সব পুঁজিপতি farmer গণ অল্প সুদে ঋণ পেতে পারে।

পূর্ব্ববর্ণিত শিল্প ও কৃষিনীতি কার্য্যে পরিণত করা হবে জনসাধারণের ওপর বেশী হারে কর ধার্য্য করে। যার ব্যবস্থা এই বৎসরের সরকারী বাজেটেই করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি বৎসর আরও একশত কোটি টাকা জনসাধারণের কাছ থেকে কর হিসাবে আদায় করা হবে। এই নীতি যে পুঁজিপতিদের স্বার্থে কি ভাবে যাচ্ছে তা কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বুঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গাপুরে একটি Cokeoven Cum Gasgrid Plant স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। এই পরিকল্পনাটি ভারতে Coal Chemistry Industryর পত্তন করবে। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বিড়লার Eastern Economist বলছেন—"Although in the initial stage"……"an investment of only Rs. 12 crores is envisaged, the hope has been expressed that, with the supply of basic materials like coke, gas, power and basic coal chemicals, a number of private industrialists would start new industries in the area. As the private sector came to know of the Durgapur project, offer have started coming for setting up new industries based on by-products of Durgapur plants."

শুধু এই নয় জনসাধারণের অর্থে সংগঠিত শিল্প জনগণের স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থে ব্যবহার হচ্ছে, তার আর একটি নমুনা দিচ্ছি।

"With Durgapur project in operation, it would be possible to supply gas to industrial consumers in bulk at Rs. 2/- to Rs. 2/8/- per one thousand cubic feet, although the rate for domestic consumers may remain at the figure of Rs. 3 to 3/8/" (The Durgapur project, Eastern Economist, No 18. may 6, 1955.)

যানবাহনের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ চলছে। যদিও Railway বহুবছর ধরে সরকারী আয়াত্ত্বাধীনে ও জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত, তবু তার বাৎসরিক কয়েক কোটি টাকা মুনাফার সামান্যতম অংশও জনসাধারণের স্বার্থে বা রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের জীবনধারণের মান উন্নয়নের কার্য্যে ব্যয় করা হয়নি। উপরন্তু প্রতি বছর রেলের নিম্নশ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অথচ অপরদিকে ভারতীয় পুঁজিপতিরা যাতে বিদেশী বাজারে তাদের মাল অধিক মুনাফায় বিক্রী করতে পারে এবং প্রতিযোগীতায় বিদেশী বাজার দখল করতে পারে তাই ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী টি, টি কৃষ্ণমাচারী ২২মে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত export advisory council এর meetingএ বক্তৃতা প্রসঙ্গে পুঁজিপতিদের রেলে প্রেরিত মালের ভাড়া কমাবার দাবীর উত্তরে বলেন We would shortly confer with the Railway and Finance minister to consider exporters difficulties with regard to freight charges. He agreed that the demand for special treatment of exports in respect of freight rates deserved consideration." (The Statesman May 23, 1955).

উপরে বর্ণিত উদাহরণগুলির সমস্তই পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে। এবার সরকারী ও বেসরকারী পুঁজির যুক্ত প্রতিষ্ঠানের অবস্থা দেখা যাক্। সম্প্রতি Imperial Bank প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয়করণ করা হয়েছে। তবে এতে বেসরকারী পুঁজিও অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এর উদ্দেশ্য দু'ভাবে চাষীদের কৃষি ঋণ দেওয়া। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে বর্ত্তমান সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ সাহায্য দিয়ে পরিপুষ্ট করে, তাছাড়া প্রয়োজন বোধে নূতন সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনের মাধ্যমে। জাতীয়করণ করতে গিয়ে এই ব্যাঙ্কের অংশীদারদের প্রতি শেয়ারে তিনগুণের বেশী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় অর্থাৎ ৫০০ টাকা মূল্যের শেয়ারে ক্ষতিপূরণ ধার্য্য হয় ১৭৬৫৷৵০ এবং ১২৫৲ মূল্যের শেয়ারের ক্ষেত্রে ৪৩১৸৪ পাই ধরা হয়। এই State Bankএর মোট পুঁজি ২০ কোটি টাকার শতকরা ৪৫ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৯ কোটি টাকার শেয়ার পুঁজিপতিদের হাতে থাকবে। এবং এই ক্ষেত্রে Imperial Bank এর অংশীদারদের শেয়ার কেনার প্রথম সুবিধা দেওয়া হবে। শেয়ারের শতকরা ৫ ভাগের বেশী কোন একজন অংশীদার ক্রয় করতে পারবেনা অর্থাৎ ৯ জন ব্যক্তি শতকরা ৪৫ ভাগ শেয়ার নিজেদের আয়ত্বে রাখতে পারবে। Director Boardএ বেসরকারী প্রতিনিধি থাকবে ৬ জন এবং সরকারী প্রতিনিধি ৮ জন। এই ৮ জনের মধ্যে আবার যারা ব্যবসা বাণিজ্যের

(৪ পাতায় দেখুন)

ভারতীয় পুঁজির সম্প্রসারণের স্বার্থে 'শান্তি'র

সম্পর্কে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন্-লাই বলেছেন—"But at the Conference we put forward no proposals, either against the occupation of Taiwan by the U.S.A. and its creation of tensions in the Taiwan area, or the restoration to the People's Republic of China of her legitimate status in the U. N. for we did not want to see the Asian-African conference bogged down in disputes and antagonisms on those two questions".

অর্থাৎ "আমরা আমেরিকা কর্তৃক তাইওয়ান দখল করা অথবা ঐ অঞ্চলে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে কিংবা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে নয়াচীনের ন্যায্য স্থান স্বীকার করার জন্য কোন প্রস্তাবই উত্থাপন করিনি যেহেতু আমরা চেয়ে ছিলাম যে ঐ দুটো বিতর্ক মূলক প্রশ্নের ওপরে যাতে এই সম্মেলন বানচাল না হয়ে যায়।" মিঃ চৌ-এন-লাই চীনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে সাথে সাথে বলেছেন "At the conference we made clear china's solemn stand on these two questions, to which none of the participating countries put any opposing views".

"কিন্তু উপরোক্ত দুইটি প্রশ্নে চীনের নীতি আমরা পরিস্কার ভাবে ব্যক্ত করি যার বিরুদ্ধে যোগদানকারী কোন দেশই কোন অভিমত ব্যক্ত করে নি।" এর থেকে নয়াচীনের নীতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ঘোষিত হয়েছে। নয়াচীন তার নিজের দেশের অত্যন্ত জরুরী দুইটি প্রশ্নকে সম্মেলনের স্বার্থেই কারোও ওপর জোর করে চাপাবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু সাথে সাথে ঐ দাবীর পেছনে সকলের সমর্থন লাভ করতেও সে পিছু পা হয়নি। পরবর্ত্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে সম্মেলনে এমন বহু প্রস্তাব ও গ্রহণ করা হয়েছে যা নয়াচীনের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই মনে রাখা দরকার যে সম্মেলনে নয়াচীনের যোগদান সম্মেলনের চরিত্রের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটালেও তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করতে সক্ষম হয়নি।

নয়াচীন ব্যতীত যে সমস্ত দেশ এই সম্মেলনে প্রাধান্য লাভ করেছে তার মধ্যে ভারত ও ব্রহ্ম দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সম্মেলন আহ্বান করার পেছনেও এদের উদ্যোগ ছিল প্রচুর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এরা কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সম্মেলন আহ্বান করেছে? শুধু কি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহান ব্রতই এদের প্রেরণা জুগিয়েছে না কি অন্য কিছু প্রশ্ন এর সাথে জড়িত আছে?

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, যে সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছে যে বিভিন্ন অনগ্রসর দেশগুলি লগ্নী পুঁজির (Foreign Finance Capital) সাহায্য নিয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। তাই অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ভবিষ্যতেও লগ্নী পুঁজির আদান প্রদান করার স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রস্তাবের এই দিক সম্পর্কে পুঁজিবাদী দেশগুলো বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল। তাই পরিষ্কার বোঝা যায় আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে যে প্রস্তাবই গ্রহণ করা হয়ে থাকুক না কেন এই অর্থনৈতিক প্রস্তাবের বলে যোগদানকারী শক্তি সমূহের সাথে (চীন প্রভৃতি দেশ ব্যতীত) সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বেশ ভাল ভাবেই বজায় থাকবে। এই দিক থেকে বিচার করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে নয়াচীনের যোগদান সত্ত্বেও পুঁজিবাদী দেশগুলো শোষণের স্বার্থে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য এবং চরিত্র অনেকাংশে এই প্রস্তাবের দ্বারা অব্যাহতই রইল।

আর এই প্রস্তাবের আর একটি দিকও বিচার করার আছে। একদিকে ঔপনিবেশিকবাদকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা অন্যদিকে লগ্নীপুঁজিকে অনগ্রসর দেশগুলোর উন্নতি বিধানে আহ্বান জানানো পরস্পর বিরোধী। নয়াচীন এই সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেনি যেহেতু সে সম্মেলনের সামগ্রিক সাফল্যে বেশী উৎসাহী ছিল।

অন্যদিকে আর একটি বিষয় থেকেও ভারত সরকার ও অন্যান্য আহ্বায়কদের ভূমিকা কিছুটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে এবং বিশেষ করে আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত সমস্ত উপনিবেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যপ্রভুর ক্ষেত্রে শুধু মাত্র এডেনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কেন? যেখানে দেখা যায় যে একমাত্র আফ্রিকাতেই এখনও বহু দেশ গ্রেটবৃটেনের উপনিবেশিক শোষণে নিপীড়িত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে উগাণ্ডা, কেনিয়া টাঙ্গানাইকা, নাইগেরিয়া গোল্ডকোষ্ট প্রভৃতি দেশে বৃটেনের উপনিবেশ থাকা সত্ত্বেও কেন সে সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হ'ল না? এর ভেতর একদিকে শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর বুলি আওড়ান অন্যদিকে বৃটিশ প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা একই সাথে দেখা যায় না কি?

এ হ'ল এই সমস্ত পুঁজিবাদী সরকারের মনোভাবের একটি দিক মাত্র। এই সম্মেলনে ভারত সরকার তথা ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর আর একটি উদ্দেশ্য অনেকাংশে চরিতার্থ হয়েছে। সে হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার বাজারগুলিতে আঞ্চলিক ভিত্তিতে আধিপত্য বিস্তার করা। আজ যাঁরা ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীকে এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অনগ্রসর মনে করেন তাদের পক্ষে বুঝতে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে যে ভারত আজ নিজের দেশের বাজার ছাড়াও তার বাড়তি উৎপাদন বিক্রীর জন্য বাইরের বাজার দখলের জন্য ব্যস্ত। এবং সেই বাজার যাতে বৃহৎ শক্তি সমূহের প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে দখল করা যায় তাই শ্রেয়ঃ। এ সম্পর্কে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্যতম মুখপত্র "Eastern Economist" ব্রহ্মদেশ এবং ভারতের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে—

"The publication···should be a reminder to us that India, like Burma, is also in need of markets.···At this time while we are thinking sectorwise in terms of national policy we have not realised that Indian industrialisation is concerned vitally with the problem of building goodwill in South East Asia".

এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে ব্রহ্মদেশের মত ভারতেরও বাজার দরকার। এবং ভারতবর্ষের শিল্পের উন্নতি দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে সৌহার্দ্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার উপরই নির্ভরশীল। এই প্রবন্ধে এমন কি এক জায়গায় বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের চাল উৎপাদনের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়া অনুচিত যেহেতু ব্রহ্মদেশ তাকে একমাত্র চালই দিতে পারে এবং সে চাল রপ্তানী করলেই ভারতের পক্ষে তার অন্যান্য মাল (টেক্সটাইল ইত্যাদি) ব্রহ্মের বাজারে পাঠানো সম্ভব। ঐ প্রবন্ধে উপসংহারে বলা হয়েছে "All that now need be said is that the present conversation which are a prelude to economic discussions at the Afro-Asian Conference to be held this month provide a testing ground both for India and Burma."

[The Perils of National Self-Sufficiency-Eastern Economist-April, 55 হইতে উদ্ধৃত]

এই সমস্ত বক্তব্য থেকে একথা কি পরিস্কার বোঝা যায় না যে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার অনগ্রসর দেশের বাজারে যাতে অতি শীঘ্র আধিপত্য বিস্তার করা যায় সেই উদ্দেশ্যই কর্মকর্তাদের অনেকের মূল উদ্দেশ্য ছিল? এবং সেদিক থেকে বিচার করলে তারা অনেকাংশে সফল হয়েছেন সন্দেহ নেই। আজকের দিনে ভারতের উৎপাদিকা শক্তি এবং সামরিক শক্তি ইত্যাদির প্রশ্ন বিচার করলে পরিস্কারই দেখা যায় যে বর্ত্তমান অবস্থায় দেশে এবং বিদেশের বাজারে আধিপত্য বিস্তার করার পক্ষে শান্তির রাজনীতিই তার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। যতদিন পর্য্যন্ত এই দুর্বলতাকে কাটাতে না পারবে ততদিন নেহরু সরকারের বৈদেশিক নীতিতে শান্তির প্রশ্ন নিশ্চয়ই স্থান পাবে।

নেহরুর শান্তি নীতি সম্পর্কে আমাদের দেশের যে সমস্ত তথা কথিত কম্যুনিষ্টরা ভাবেন যে তাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শান্তি আন্দোলনের চাপেই ভারত সরকার শান্তি নীতি গ্রহনে বাধ্য হয়েছে, তা তাদের আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

নেহেরু সরকারের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে এমনকি বান্দুং সম্মেলনে ভারত-সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি কেন যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তা আমাদের বুদ্ধির অতীত। ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কর্ণধার—যে ব্যবস্থা শুধু দেশের লোককেই নয় বিদেশের জনতাকেও শোষণ করতে উদ্যত, পণ্ডিত নেহরুর ভূমিকাকে যখন সত্যিকারের শান্তি প্রচেষ্টা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় এবং এমনকি চৌ-এন-লাই এর ভূমিকার সাথে তুলনা করা হয় তখন এই সমস্ত সাম্যবাদীদের প্রকৃত চেহারা অতি সহজেই উদ্ঘাটিত হয়। অবশ্য একথা বলার অর্থ এই নয় যে নেহরুর পঞ্চশীল বা সহ-অবস্থানের নীতি বান্দুং সম্মেলনের নানা ডামাডোলে শান্তি রক্ষায় কোন সাহায্যই করেনি। ভারত ও ব্রহ্মদেশের সরকারের এই সহ-অস্তিত্বের নীতির সাথে চীনের প্রকৃত শান্তি নীতি মিলিত হওয়ায় বান্দুং সম্মেলনের ঘোষণা শান্তির স্বপক্ষে গেলেও যোগদানকারী শক্তিগুলোর প্রকৃত ভূমিকা অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

রাজনীতিই বর্ত্তমানে সবচেয়ে উপযোগী

সমাজতন্ত্র নয়, পুঁজিবাদকে সুসংহত করাই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারাই থাকবে। প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ Commercial Bank যে নিয়মে পরিচালিত হয় সেই নিয়মে পরিচালিত হবে। এর থেকে কি বোঝা গেল? অর্থাৎ জনসাধারণের উপর কর ধার্য্য করে প্রতি বৎসর সরকার যে টাকা আদায় করেন সেই টাকা Imperial Bankএর বড় বড় মালিকেরা ক্ষতিপূরণ হিসাবে পেল এবং এই টাকা বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগ করার সুযোগ পেল। উপরন্তু Bank এর বড় বড় অংশীদারগণ State Bank এ ও টাকা খাটাবার সুযোগ পেল। দ্বিতীয়তঃ Director Board এর গঠন প্রকৃতিও এমন এবং Commercial Bankএর পদ্ধতিতে পরিচালনার নীতি গ্রহণের দরুণ বড় বড় পুঁজিপতিরা এর মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থে ব্যাঙ্ক পরিচালিত করতে পারবে। কৃষিঋণের ক্ষেত্রেও বড় বড় farmerদের বেশী সুবিধা দেওয়া হবে Commercially risky এই অজুহাতে ছোট ছোট কৃষক বা যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলি যারা ঋণের বদলে securityর ব্যবস্থা যথোপযুক্ত পরিমাণে করতে পারবেনা তারা Bank এর কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাবেনা এবং এর ফলে বড় বড় farmerদের কাছে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হবে এবং সমস্ত জমি পুঁজিবাদী farmerদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হবে নয় দেনার দায়ে বিকিয়ে যাবে। আজকে পরিষ্কারভাবে জনসাধারণকে এই কথাই বুঝতে হবে যে পরিকল্পনা তাদের স্বার্থে কাজ করবেনা। এবং এর দ্বারা মূল শিল্পগুলি যেমন ইস্পাত, কয়লা, বিদ্যুৎ, যানবাহন, heavy chemicals এবং উৎপাদন যন্ত্র প্রস্তুতকারী শিল্প অর্থাৎ যার উপর সমস্ত শিল্প কাঠামো নির্ভর করে সেইগুলি রাষ্ট্রায়ত্তাধীনে আনবে। এবং এর উপর নির্ভরশীল শিল্প গড়ে তোলার জন্য পুঁজিপতিদের কম দামে মাল সরবরাহ করা হবে। মূল শিল্পগুলি যাতে বিভিন্ন পুঁজিপতিদের হাতে পড়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় দুর্ব্বল না হয় তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। অন্যদিকে, সরকারী ও বেসরকারী পুঁজিবিশিষ্ট যৌথ প্রতিষ্ঠান করার উদ্দেশ্য ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যবসাক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিয়ে একচেটিয়া পুঁজির পত্তন করা।

উপরে বর্ণিত ধনিক তোষণ নীতিকে সমাজতান্ত্রিক নীতি ব'লে প্রচার করা হচ্ছে। এই নীতি কোন অংশেই নূতন নয়। ইউরোপের দিকে তাকিয়ে দেখলে এর নিদর্শন পাওয়া যাবে। বৃটেন থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত এই একই নীতি অল্পবিস্তর চালু আছে। এই নীতি জার্মানী ও ইটালীতে ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। এই নীতির ফলে অধিক মুনাফার ভিত্তিতে যে শিল্প গড়ে উঠবে তার উৎপন্ন মাল সঙ্কুচিত বাজারে যা এখনই কয়েকটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশের কুক্ষিগত রয়েছে ও বিক্রী করার সুযোগ সুবিধা মিলছে না তখন দেশীয় পুঁজিপতিরা চিরাচরিত নিয়মে বাজার দখলের হুমকি ছাড়বে এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হবে। বাজার দখলের প্রয়োজনীয়তা ও অত্যুৎপাদনের সঙ্কট দেশের অভ্যন্তরে ফ্যাসিবাদের জন্ম দেবে। ভারতীয় পুঁজিপতিরা অনিবার্য্যভাবেই সেই দিকে এগিয়ে চলেছে। ইউরোপের মত ফ্যাসীবাদের জন্ম নেবার ভারতে কোনদিন সম্ভাবনা নেই। ইউরোপে যে সময় ফ্যাসীবাদের উন্মেষ দেখা যায়, তখন আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং যে সব দেশে ফ্যাসীবাদ গড়ে ওঠে তাঁদের অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যা ছিল, বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সেই অবস্থা বজায় নেই। জার্মাণী বা ইটালীর জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী লগ্নী পুঁজির প্রভাব ছিল না এবং মূল শিল্পের ক্ষেত্রেও তারা পর মুখাপেক্ষী ছিল না। জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ও রাজনীতিক সংগঠণের ক্ষেত্রে তাঁরা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যেতে নেমে ছিল। দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার অবস্থান নূতন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। 'কলোনী'গুলির স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরের শ্রেণী সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে নূতন পথের সন্ধান পায়। এটা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে মোটেই আনন্দের ব্যাপার হোল না। তাই তাঁরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি গ্রহণ করে সোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জার্মাণীতে ফ্যাসিবাদ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। উদীয়মান প্রতিযোগি জার্মাণী ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধানো এবং সেই সুযোগ সংঘর্ষে দুর্ব্বল দেশ দুইটির উপর খবরদারী করার স্বপ্ন তাঁরা দেখছিল। তৃতীয়তঃ প্রায় সব পুঁজিবাদী দেশই আজকে অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে বদ্ধ। সোভিয়েটকে ধ্বংস করার জন্য আমেরিকা এই সব দেশগুলিকে একজোট করার চেষ্টা করছে। এবং কোন দেশে ফ্যাসীবাদের, যা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় নূতন ভাবে ফাটল ধরাব উন্মেষ ঘটতে আমেরিকা দেবে না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলি নিজেদের দেশে ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করবে না বরং পুজিবাদী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থাকার ফলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশের প্রতিযোগিতা শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করবে। ভারতের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। ভারতে বিদেশী লগ্নী পুঁজির অবস্থিতি শিল্পের দিক থেকে বিশেষ করে ভারী শিল্পের দিক থেকে পরমুখাপেক্ষীতা এবং পূর্ব্ব আলোচিত আন্তর্জাতিক অবস্থা ঐ ধরণের ফ্যাসীবাদের উন্মেষ ঘটতে না দিলেও, ভারতে এমন কয়েকটি অবস্থা বিদ্যমান যা দেশে মূল নাগরিক অধিকার ধ্বংস করে পুলিশী রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করবে এই অবস্থা গুলি জার্মাণীতেও বিদ্যমান ছিল। ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্র কাঠামোকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে এবং আভ্যন্তরীণ শ্রেণী দ্বন্দ্ব দূর করে ভাল ভাবে শোষণ করবার জন্য দেশীয় জমিদার শক্তির সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনার মারফৎ রাষ্ট্রপুঁজির সৃষ্টি এবং বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতা করে বাজার দখলের উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য জনসাধারণকে বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা চলেছে। রাষ্ট্রপুঁজি সৃষ্টিকে সমাজতন্ত্রের আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, এবং জাতীয় শিল্প ও জাতীয় অর্থনীতির শ্লোগোনের মারফৎ উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচার চলেছে। দেশের সমস্ত আন্দোলন জোর করে দমন করে দেবার চেষ্টাও হচ্ছে, যার নমুনা আমরা অমৃতসর ও কানপুরের ধর্মঘটের ব্যাপারে মালিক ও সরকারের অমননীয় মনোভাবের মধ্য থেকে দেখতে পাই।

মিলিটারী বাজেটও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়ার ফোর্স গঠন করে তাদের Semi-military training দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়—এদের বিভিন্ন রকম কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে যাতে এদের ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজে ব্যবহার করা যায়। কিছুদিন পূর্বে এই National Volunteer forceকে কোলকাতার ডক শ্রমিক ধর্মঘট ও ফায়ার ব্রিগেডের fall-inএর সময়ে কাজে লাগিয়ে ধর্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয়।

ভারতের পুঁজিপতি সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনার মারফৎ ভারতের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-কাঠামোকে সুসংহত করারই চেষ্টা করছে। তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জনসাধারণের জীবিকার মান উন্নয়ন করবে বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে এ ধরণের প্রচার করা জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর।

কাটিহার 'প্রফেশন্যাল ট্যাক্সের' প্রতিরোধ

বিহারের পূর্ণিয়া জিলার কাটিহার মিউনিসিপ্যালিটি প্রফেসন্যাল ট্যাক্স বসাইবার ঘোষণা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছে। জীবিকার আয়ের উপর এই করভার বিশেষ করিয়া অল্প আয়ের লোকের উপর এক অস্বাভাবিক বোঝা স্বরূপ হওয়ায় স্থানীয় লোকদের মনে গভীর বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ বহু আবেদন নিবেদন করা সত্বেও মিউনিসিপ্যালটি কর্তৃপক্ষ কর ধার্য্য করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমূহের নিষ্ক্রিয়তা কর্তৃপক্ষের জেদ বজায় রাখিতে সাহায্য করে। এস, ইউ, সি'র স্থানীয় সংগঠক কমরেড রমণী শেখর ঘোষ প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাছে সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসার আবেদন করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গত ১৭ই মে হইতে মিউনিসিপ্যালিটির সম্মুখে অনশন ধর্মঘট সুরু করেন—তৃতীয় দিনে স্থানীয় বিড়ি মজদুর কমরেড মকবুল আসিয়া অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। কমরেড রমণী শেখর ঘোষ ও মকবুলের অনশন জনসাধারণ-এর মনে আন্দোলনের মনোভাব জাগাইয়া তোলে। তখন রাজনৈতিক দল সমূহ মিলিত হইয়া সভা, প্রচার ও ২৬শে মে সাধারণ হরতালের কার্য্যক্রম গ্রহণ করে। সাধারণ হরতালের অভূতপূর্ব সাফল্য এবং হরতাল শেষে ২৬শের বিরাট জমায়েৎ দেখিয়া কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ও এস, ডি, ও 'প্রফেসন্যাল ট্যাক্স' স্থগিতের নির্দেশ দেন এবং কমরেড ঘোষ ও মকবুলের অনশন প্রত্যাহারের আবেদন জানান। আপাততঃ কর রহিত করায় কমরেড ঘোষ ও মকবুল অনশন ত্যাগ করেন।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক ২৩ নং ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।